ইসলাম এবং কুসংস্কার-(দ্বিতীয় খন্ড)

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ এস এ
জুন ১০, ২০০৪

(পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ যে যারা আমার 'প্রথম খন্ড 'পাঠ করিয়াছেন তারা ইচ্ছে করলে 'ভূমিকাটি' স্কীপ করতে পারেন, কারণ এই ভূমিকা প্রত্যেক খন্ডতেই যাবে এবং ভূমিকা একই থাকবে, যদিও দ্বিতীয় খন্ডে ভুমিকাটিকে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধিত করা হয়েছে। অবশ্য যারা আমার প্রথম খন্ড পড়েন নাই, তাদের জন্য এই ভূমিকাটি অতি প্রয়োজনীয়। ক্রমাগত ভাবে প্রত্যেক খন্ডে সুধু ইসলামী কুসংস্কারগুলোর নতুন ক্রমিক নং হিসেবে আরও নতুন নতুন চমকপ্রদ সব আজগুবি ইসলামী কেচ্ছা-কাহিনী চলতে থাকবে।)

ভূমিকা

আমরা সবাই জানি যে কুসংস্কার হল কোন popular belief held without any reason or logic. অর্থাৎ কিনা কোন প্রমান বিহীন কথা যাহা সাধারনতঃ মুর্খরা অন্দ্ধভাবে বিশ্বাস করে থাকে। এই কুসংস্কার আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন, রূপকথার (Folklore) কাহিনী যাহা কুসংস্কার হলেও তাকে লোকগাতা বা কেচ্ছা-কাহিনী হিসেবেই ধরা হয়। অন্যটি হল ধর্মীয় কুসংস্কার যাহা একটি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নিহিত থাকে। মুলতঃ অজানা ভয়, পরকালের চিন্তা এবং অলৌকিকতা থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়। ব্যাপারটি আরও পরিস্কার করে বললে এটাই দাড়ায় যে মানুষের পরকালের অজানা ভয় এবং তা' থেকে সৃষ্ট অবাস্তব কুসংস্কার থেকেই জন্ম হয়েছে পৃথিবীর সকল ধর্ম। তাই দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মের আসল উপাদান (Ingredients) হল কিছু অবাস্তব কুসংস্কার। বিশ্বের প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মেই দেখা যায় অনেক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এদিক থেকে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার এর ছড়াছরি। ইসলাম ধর্মে এত বেশি কুসংস্কার পাওয়া যায় যে এই ধর্মটির মুল স্তম্ভটিই দাড়িয়ে আছে কিছু পৌরানিক এবং অলৌকিকতাপুর্ন কুসংস্কারের উপর।

ইসলামের মুল কিতাব কোরান এবং অসঙ্খ্য হাদিস পড়লে এমন অনেক কুসংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করেই সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উম্মাদনা বা fanatical believers বা অন্ধবিশ্বাসীদের ধর্মীয় মাতম।

বাংলাদেশের বাজারের আনাচে-কানাচে খোজ করলে দেখা যায়, বাজারের বুক-স্টোর, ইসলামিষ্টদের লাইব্রেরী গুলোতে, এমনকি শহরের ফুটপাতেও (*ফাতেমোল্লার ফুট পাতের চাঁদ তাঁরা)* এরূপ হাজার হাজার ইসলামী কিতাব পাওয়া যায় যেগুলোতে কুসংস্কার এ ভর্তি। এইসব ইসলামি কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বই যেমনঃ **বেহেস্তের কুঞ্জি, বেহেস্তী জেওর, মোকসেদুল মুমিনিন, কাছাছুল আম্বিয়া, নেয়ামুল কোরান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়।** এইসব ইসলামী কিতাব বাংলা দেশের মত মুসলিম দেশে এত বেশি জনপ্রিয় যে পাবলিসার্স গন ৩০-৪০টি সংস্করন বের করেও কুলোতে পারছেন না।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি কিতাবের মধ্যে **'কাছাছুল আম্বিয়া'** সম্বন্ধে কিছু কথা বলা এখানে অতি প্রয়োজন মনে করছি। এই ইসলামী কিতাবটি অন্যসব ইসলামী কিতাব থেকে বেশ আলাদা ভাবে ধরা হয়। কারণ এই কিতাবটি কোন মোল্লা-মাওলানার নিজের মনগড়া কথায় ভর্তি নয়; এই কিতাবটির নাম **'কাছাছুল আম্বিয়া'** যার অর্থ দাড়ায়—**'নবীগনের জীবনী'**। এই বইটিতে আরবের

বুকে যত নবী পয়দা হইয়াছে এবং যাহাদের নাম পবিত্র কোরানে এবং হাদিছে জায়গা পেয়েছে তাদেরই জীবন-কাহিনীতে ভর্তি। অর্থাৎ, এই কিতাবে যাহা লিখা আচে তাহা পবিত্র কোরান ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রচিত হয়েছে এবং এই বইটির (আমি যে বইটি ব্যবহার করছি) প্রনেতা একজন সুশিক্ষিত মুসলমান নাম তার– এম, এন, এম ইমদাদুললাহ (এম এ; বি এ (অনার্স); এম এ)। কিতাবটির আকৃতি এবং চেহারা একেবারে কোরানের ন্যায় এবং এর সম্মানও অনেক বেশি। লাইব্রেরী গুলোতে এবং ভক্তদের ঘরে একেবারে উপরের Shelf এ কোরানের ঠিক পাশেই তার স্থান হয়। বইটির দামও বেশ, বলতে গেলে একটি অনুবাদ কোরানের চেয়ে মুল্য অধিক। এই কিতাবের ৯০% কথাবার্তাই ভীষন কুসংস্কারে পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং এইসব আবেগ পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী—সাধারন বিশ্বাসী মুসলিমগন পড়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আরওবেশি করে নামাজ-রোজাতে মনোনিবেশ করবে এবং যাদের বিশ্বাস হাল্কা বা বিশ্বাস নেই তারা এইসব আজগুবী কথা পড়ে হেসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে।

যা হউক, এসব কুসংস্কার পুর্ন ইসলামী কিতাব গুলো বাংলাদেশের ঘড়ে ঘড়ে পাওয়া যাবে এবং **এইসব কিতাবই হল বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম-আমজনাতার আসল শিক্ষক বা গুরু।** ইসলাম ধর্মের অনেক শিক্ষাই এরা পেয়ে থাকে এইসব ইসলামী কিতাব থেকে। আর এইসব কিতাবের প্রভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম-আমজনতার কাছে ধর্মীয় পীর-ফকির-দরবেশগন অতি প্রিয় হয় যে কারনে বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে পীরের ব্যবসা, তাবিজের ব্যবসা একেবারে রমরমা।

বাংলাদেশের গাও-গ্রামে এমনকি আজকাল শহরেও অসংঙ্খ্য ইসলামি জলসা বা ওয়াজ-মাহফিল হয়ে থাকে যেখানে হাজার হজার সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, এমনকি অনেক শিক্ষিত বড় বড় ডিগ্রিধারী অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানরাও মাওলানাদের ওয়াজ তম্ময় হয়ে শুনে থাকে। এইসব মাওলানাদের বক্তব্যে **বেশি অংশই থাকে কুসংস্কার পুর্ন ইসলামের বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী এবং নানারঙ্গের ধর্মীয় উপাখ্যান।** বলা বাহুল্য, উপরোল্লিখিত **'কাছাছুল আম্বিয়া'** কিতাবটিই যে মাওলানাদের আসল সম্বল, এতে কোন সন্ধে নেই। এইসব কুসংস্কারপুর্ন গল্প মাওলানাদের মুখে শুনার পর গ্রাম্য সাধারণ মুসলমানদের মনে অনেক কুসংস্কারপুর্ন কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস হয় এবং তাদের মনে সর্বদা কুসংস্কারপুর্ন ভয়ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তারা সকলেই একটা অজানা অলৌকিকতার সাগরে সদাসর্বদা ডুবে থাকে।

ছোটবেলা এমনি অনেক ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে মাওলানাদের সুমধুর কণ্ঠে অনেক কুসংস্কারপুর্ন গাজাখুরি গল্প শুনে মাঝে মাঝে চিন্তা হত যে এইসব মাওলানারা কোথায় পায় এত কুসংস্কার। তাদের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হতাম। এখন দেখছি যে ইসলামি কিতাব গুলোতে কুসংস্কারের কোন অভাব নেই মা'শাল্লাহ। উল্লেখিত ঔসব ইসলামী কিতাব থেকেই পাঠদকদের জন্য কিছু ইসলামি কুসংস্কারের নমুনা পেশ করছি আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে। উল্লেখ্য, এইসব কুসংস্কার ইসলামী কিতাব থেকে হুবুহ তুলে দিচ্ছি এবং ইহাতে আমার নিজের সৃষ্টি কিছুই নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার অল্পকিছু রসালো মন্তব্য *(ব্রাকেটের ভিতরে)* থাকবে। আমার এবারকার ইসলামি কুসংস্কারে সিরিজ কেছুদিন ধরে চলবে আশ করি। এবারে আসুন, আমরা খুজে দেখি মুসলিম-আমজনতা কি ধরনের কুসংস্কারে সর্বদা ডুবে থাকে!

(বিঃ দ্রঃ- পুর্বের সঙ্খায় ১-৫ প্রকাশ হয়েছিল)

(৬) আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদের (দঃ) ঘাম থেকে কি কি তৈয়ার করেছেন!

আলাহ তায়ালা যখন ময়ুর আকৃতির মুহাম্মদী (দঃ) এর দিকে স্নেহভরে নজর করেন তাতে নুরে মুহাম্মদী যারপর নেই লজ্জানুভব করেন এবং তাহার সর্ব শরীর হইতে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হইতে থাকে। তখন আল্লাহতায়ালা তাহার মুখ-মন্ডলের ঘর্ম থেকে আরশ-কুরসী, ফেরেস্তা, লওহ,

কলম, চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আসমান-যমিন এবং সমুদয় রাসুল, আম্বিয়া, আউলিয়া, ছালেহীন, সিদ্দিকীন, নেককার খানায়ে কা'বা শরিফ এবং দুনিয়ার সমুদয় মসজিদের মৃত্তিকা তৈরী করেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা ময়ুররূপি মুহাম্মদী নুরকে বলেন 'হে আমার পেয়ারের দোস্ত' তুমি তোমার প্রিয় দোস্তদের দিকে নজর কর। তখন, মুহাম্মদী নুর তার সামনে-পিছনে, ডাইনে, বামে চারিটি অতি উজ্জল নুর অবলোকন করেন। এই নুর চতুষ্টয় হল হযরত রসুলে করিম (দঃ) এর পার্থিব জীবনের প্রিয় সহচর যথা হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), এবং হযরত আলী (রাঃ)। এই চারটি উজ্জল নুর নুরে মুহাম্মদী (দঃ) এর সহিত একই সাথে সত্তুর হাজার বৎসর ধরে আল্লাহ তায়ালার গুনকির্তন করতে থকেন। অতপর আল্লাহ মুহাম্মদী নুর থেকে সমস্ত নবীর রূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সকলের দ্বারা আখেরী নবীর কলেমা শরীফ—**'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'** পাঠ করাইলেন।

(৭) মুহাম্মদী নুর দর্শন থেকে কি ভাবে দুনিয়ার সকলের ভাগ্য নির্দারিত হইল!

আল্লাহ তায়ালা ময়ুররূপি মুহাম্মদী (দঃ) নুরকে অবিকল দুনিয়াবীরূপে পরিনত করিয়া তাকে একটি স্বচ্ছ লাল বর্ণের আকীক পাথরের লণ্ঠনের ভিতর রেখে দিলেন এবং 'লওহে মাহফুজে' রাখা সকল রূহকে নির্দেশ দিলেন আল্লাহর প্রিয় হাবিবের দিকে দৃষ্টিপাত করতে। আল্লাহর আদেশে কিছু সংখক রূহ ছাড়া সমস্ত রূহই লণ্ঠনে রাখা শেষ নবীর আকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সকল রূহ শেষ নবীর সর্বাঙ্গ দেখিতে পাইল না। একেক জন নবীর কেবল একটি অঙ্গ দেখিতে পাইল।

এখন দেখা যাক মুহাম্মদী (দঃ) নুরের কে কি দেখিল! যে রূহগন মস্তক দেখিল তাহারা সকলে দুনিয়াতে শাসক বা বাদশাহ হইল (*আলেক জান্ডার দ্যা গ্রেট, চেঙ্গিশ খান, হিটলার, প্রেসিডেন্ট বুশ এরা নিশ্চয়ই মুহাম্মাদী নুরের মস্তস্ক দেখিয়াছিল*)। যেসব রূহগন ললাট দেখিল তাহারা ন্যায় বিচারক, যারা চক্ষের ভ্রূ দেখিল তারা চিত্রকর, যারা চক্ষুদ্বয় দেখিল তারা হাফেজে কোরান (*রাজাকার সাঈদী গং, আল-কায়েদা এবং তালেবানগন নিশ্চয় চোঁখ দেখিয়াছিল)* হইল, যারা গন্ডদ্বয় দেখিল তারা জ্ঞানী ও দাতা হইল, যে রূহগন চক্ষুর মনি দেখিল তারা আতর ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসক হইল, যারা দন্ত দেখিল তারা ধৈর্যশীল হইল, যারা মুখমন্ডল দেখিল তারা শক্তিমান বীর পুরূষ হইল, যে ব্যক্তি জিব্বা দেখিল তারা বাদশা-খলিফাদের দুত হইল, যারা হলকুম দেখিল তারা মুয়াজ্জিন কিংবা বক্তা হইল, যারা গরদান দেখিল তারা ব্যবসায়ী, যারা উভয় বাহু দেখিল তারা তরবারি ও বন্দুক ধারী যোদ্ধা হইল, যারা সুধু ডান হাত দেখিল তারা ঘাতক বা জল্লাদ হইল, যারা হাটু দেখিল তারা পাক্কা নামাজী হইল, **এবং এভাবে সবকিছু দেখা শেষে যখন একদল রূহগন মুহাম্মাদী নুরের কিছুই দেখিতে পাইল না তারা সবাই ইহুদী এবং নাছারা বনে গেল। আর যারা মুহাম্মদী (দঃ) নুরকে মোটেই দেখিতে চাইলনা তারা সকলে কাফের-মুশরেক বনে গেল।**

(৮) আল্লাহ কি ভাবে পানি এবং সপ্ত ধাতু তৈরী করিয়াছেন!

আল্লাহ তায়ালা পরয়ারদিগার স্বীয় কুদরতে একটি ইয়াকুতের দানা সৃষ্টি করলেন এবং তার দিকে আল্লাহর কুদরতি নজর দিলে ইয়াকুতের দানা ভয়ে একেবারে গলিয়া পানির সৃষ্টি হইল। অতপর আল্লাহ হাওয়া সৃষ্টি করে চতুরদিকে পাঠিয়ে আদেশ করিলেন বেগে প্রবাহিত হয়ে পানিতে ফেনার সৃষ্টি করতে। বাতাস তার কাজ করে পানিতে প্রচুর ফেনার সৃষ্টি করল। তারপর সেই ফেনাসমুহের পরস্পর সংঘর্ষনের ফলে আগুনের সৃষ্টি হইল এবং আগুন থেকে ধুয়ার সৃষ্টি হইল। আল্লাহ তখন সেই ধুয়াকে সাতভাগে ভাগ করলেন। উহার প্রথম ভাগ পানির আকারেই রহিল, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে তামার সৃষ্টি হল, তৃতীয়ভাগ দিয়ে লৌহ সৃষ্টি হল, চতুর্থভাগ, রৌপ্য, পঞ্চম ভাগ স্বর্ন, ষষ্ঠভাগ মারওয়াবিদ প্রভৃতি মুল্যবান প্রস্তর, এবং সপ্তম্ভাগ দিয়ে ইয়াকুত তৈরী হল। *(এই গাজাখুরী*

গল্পটিতে অনেক ইসলামী বিজ্ঞান আছে যাহা বুদ্ধিমানের জন্য নিদর্শন!)

(৯) আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ তৈরী করিলেন!

আল্লাহ তায়ালা মাবুদ তার কুদরতের দ্বারা পানি দিয়ে প্রথম আকাশ বানালেন, তামা দিয়ে দ্বিতীয় আকাশ, লোহা দিয়ে তৃতীয় আকাশ, রোপ্য দিয়ে চতুর্থ আকাশ, স্বর্ন দিয়ে পঞ্চম আকাশ, মার ওয়াবিদ দিয়ে ষষ্ঠ আকাশ তৈরী করিলেন, এবং ইয়াকুত প্রস্তর দিয়ে সপ্তম আকাশ তৈরী করেন। একেক আকশ থেকে অন্য আকাশের দুরত্ব হইল পাচশত বৎসরের পথ এবং উহার একেকটি পুরু প্রায় পাচশত বৎসরের পথ। *(আমেরিকান Astronaut গন পঞ্চম আকাশে যেয়ে বিরাট এক খন্ড আকাশ ভেঙ্গে নিয়ে আসলেইত লেটা চুকে যায়!)।*

(১০) আল্লাহ আমাদের এই পৃথিবী কিভাবে বানালেন!

আল্লাহ তায়ালা মাবুদ প্রথমে তার কুদরতি পানি থেকে উদ্ভুত ঘনিভুত ফেনা থেকে একমুষ্টি লাল মাটি বানালেন এবং তাহা প্রথমে কা'বা তৈরীর জায়গাতে রেখে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, এবং আজ্রাইল—**এই চারি প্রধান ফেরেস্তা উক্ত লাল মাটির চারিদিকে ধরিয়া সজোরে টনিতে লাগিল। যাহার ফলে সেই লাল মাটি একটি সুবিস্তীর্ন চেপ্টা যমিনে পরিনত হইল যাহা হইল আমাদের এই বিশাল পৃথিবী।**

(সম্ভবতঃ বাংলাদেশের জয়দেবপুরের লাল মাটিও আল্লাহর সেই একমুষ্টি লাল মাটি থেকে এসেছে! আল্লাহ নিশ্চয় একজন খুব বড় বিজ্ঞানী ছিলেন!)।

(১১) আমাদের এই বিশাল চেপ্টা পৃথিবী কিসের উপরে স্থাপিত!

ছহি হাদিসের বর্ণনা মতে একদিন হযরত আবদুল্লাহ মুসলেম (রাঃ) হুযুরে পাক (দঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রাসুল্লাহ (দঃ)! বলুন এই বিশাল যমিন কিসের উপর স্থাপিত আছে? তখন রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—'এই সপ্তস্তর বিসাল যমিনকে আল্লাহ তায়ালা করুনাময় একটি গরুর শৃঙ্গের উপরে স্থাপন করিয়াছেন। গরুটির রহিয়াছে চারি হাজার শৃঙ্গ এবং তার একটি সিং থেকে অন্যটি সিং এর দুরত্ব পাচশত বৎসরের পথ। উক্ত বিশালকায় গরুটি দাড়িয়ে আছে একটি সুবিশালকায় মৎসের পিঠের উপর। ঔ মৎসটি ভাসিয়া আছে আঠাই পানির ভিতরে এবং সে পানির গভীরতা চল্লিশ বৎসরের পথ। সেই পানি ভেসে আছে ভাসমান বাতাসের উপর। উক্ত বাতাস বা বায়ুমন্ডল রহিয়াছে অন্দ্ধকারের উপরে। উক্ত অন্দ্ধকার রহিয়াছে দোজকের উপরে এবং সেই দোজক স্থাপিত আছে একটি বিশালকায় পাথররের উপরে। সেই পাথরটি স্থাপিত আছে একজন মহাবলবান ফেরেস্তার মাথায় এবং ঔ বিশালকায় ফেরেস্তা দাড়িয়ে আছে হাওয়ার উপরে আর সেই হাওয়া রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের শুন্য জগতে।' *(এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পুর্বে নিশ্চয়ই আমাদের পেয়ারা নবী (দঃ) কম করে হলেও দশ ছিলিম বিশুদ্ধ গাজা টেনেছিলেন!)।*

সুত্রঃ কাছাছুল আম্বিয়া; সৌদী কর্তৃক পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা মহীউদ্দিন খান); মু'কসেদুল মুমিনিন ; বেহেস্তের জেওর।

(চলবে)